ছোট পত্রিকা কি প্রকৃত অর্থেই অপ্রাতিষ্ঠানিক?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

[নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় এই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩। বক্তৃতাটির লিখিত রূপ এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।]

এ আলোচনার শুরুতে প্রথমেই নিজেকে এবং আমার তরুণ লেখকবন্ধুদের সেই কথাটা আরও একবার বলে নেওয়া। লিটল ম্যাগাজিন হোক বা প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাগাজিন, আমাদের কিন্তু লিখতেই হবে, এবং আবশ্যিকভাবে সেই লেখার প্রতি সৎ থাকতে হবে। এখন আপনারা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন আজকের বলাটা আমার পক্ষে ঠিক কতখানি কঠিন, কারণ মঞ্চে দেবব্রত বিশ্বাস, সুবিনয় রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এঁরা সব একটু আগেই তাঁদের অসাধারণ গান গেয়ে চলে গিয়েছেন; ফলত পাড়ার কমল অথবা বিমলের গান আপনাদের কাছে কতখানি মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে, তা আপনাদেরই বিবেচনাধীন। স্বীকার করে নিচ্ছি এ নিয়ে আমি নিজেই খানিকটা ভয়ে।

বলার জন্যে অবশ্য সম্পাদকমশাই আমাকে আগে থেকেই একটা বিষয় বেছে দিয়েছেন এবং বিষয়টা হচ্ছে এই — যে, এখনও কি লিটল ম্যাগাজিনগুলো অপ্রাতিষ্ঠানিক? বলা বাহুল্য এই প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়। প্রশ্নটাতে ঢুকতে গেলে অবশ্য আমাদের ভাবনাকে উসকে নিতে হবে আরও একটি প্রশ্নেরই দিকে এবং সেই সমীচীন প্রশ্নটি হল, প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? প্রতিষ্ঠান সত্যি কাকে বলে? আপনারাই বলতে পারবেন আমার থেকে ভালো, আমি শুধু যেটুকু মনে করি সেটুকু এখানে বলে যাই, প্রতিষ্ঠান হচ্ছে তাই, যা নিজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং অন্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছে। যাদের নিজস্ব একটা শক্তপোক্ত শিকড় আছে, কাণ্ড আছে, এবং তার অসংখ্য ডালপালা ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। এবং অবশ্যই, যাদের একটা আর্থিক পুঁজির নিশ্চয়তা আছে, তারাই প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান আসলে যে প্রতিষ্ঠা পেতে পারল, দিতে পারল প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠানকে আমরা অনেকেই অনেক কিছু বলেছি, হয়ত দেখেওছি একটু অন্য চোখে কিন্তু এই কথাটা আমাকে আপনাকে মেনে নিতেই হবে — প্রতিষ্ঠান যে তার শীর্ষে গিয়ে পৌঁছতে পারল, তার পেছনে কি তাদের কোনও শ্রম, তার পেছনে কি তাদের কোনও অনুশীলন, কর্মকুশলতার জায়গা ছিল না? তা না হলে তারা এতটা দূর যেতে পারল কেন? আমাকে কিন্তু তার কৃতিত্বটা স্বীকার করে নিতে হবে।

এইবার আমি এর উল্টোদিকে লিটল ম্যাগাজিনকে স্থাপন করি। শঙ্খবাবুকে একবার তারুণ্যের অতি উৎসাহে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম, 'স্যার, আপনি লিটল ম্যাগাজিনকে কী চোখে দেখেন?' আর কী আশ্চর্য, অপ্রত্যাশিত উত্তরে উনিও একটা দারুণ কথা বলেছিলেন, বইমেলা থেকে মাঠে নামতে নামতে। খুব শ্রদ্ধেয় মানুষ তো, করুণ তরুণকে অবহেলা করেননি। প্রথমে অবশ্য উনি আমাকে ফিরিয়ে দেন

প্রশ্নটি। আমি নিরুত্তর থাকি সংকোচে। অত বড় মানুষের কাছে কী বলব, সেই ভেবে। পরে অবশ্য উনি বললেন, 'যে কাগজে সমাজ বদলের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যে কাগজে তারুণ্যের প্রাণ-স্পন্দন পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা থাকে লিটল ম্যাগাজিনের প্রাণ।' আমার মতে লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটা লিখে দিয়ে গেছেন বুদ্ধদেব বসু। সম্প্রতি এই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকেই বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তার চার নম্বর খণ্ডে আপনারা যদি দেখেন, সম্ভবত তিনশ ঊনচল্লিশ পাতাতে, দেখবেন প্রথম স্তবকেই দু'রকমের পত্রিকার কথা একেবারে সটান বলে দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। এক ধরণের পত্রিকা, যাদের আমরা ট্রেনে যেতে যেতে পড়ি, একটু দু'চারটে পাতা উল্টে দেখি, এবং নিজের অগোচরেই পাশে ফেলে রেখে যাই, পরবর্তী স্টেশন এলে নেমে যাবার উপক্রম হলে সেটাকে নিতে ভুলেও যাই, যদি না সহযাত্রী আমাকে ওই পত্রিকাটি হাতে তুলে দেন। আর এক ধরণের পত্রিকা আছে। যাদের আমরা রাখতে চাই প্রিয় মানুষের মতো, যাদের মূল্যকে বারবার ধরে খুঁজে পেতে চাই, যাদের আমরা ন্যাপথলিন দিয়ে কাগজের ফাঁকে বা কাঁথার মাঝখানে রেখে দিই। অনেক বছর পর আবার হয়ত সেটা আমাদের কাজে আসবে। এই যে রিপিট ভ্যালু, পুনরায় যার মূল্য আমরা আবিষ্কার করতে পারব, এটা লিটল ম্যাগাজিনের লেখা থেকে পাঠকের খুব বড় প্রাপ্তি।

এখন দেখুন বুদ্ধদেব বসুর সেই সংজ্ঞাটির কাছে নিজেকে নিবিষ্ট করেও আমার যেটা মনে হয়, যে লিটল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞা, মানে কাকে লিটল ম্যাগাজিন বলে — এই প্রশ্নের উল্টো দিকে কাদের আমরা লিটল ম্যাগ বলতে পারব না, সেদিক থেকে প্রশ্নটার বিচার করা জরুরি। থিসিস ইন্টু এন্টিথিসিস ইকোয়্যালস টু সিন্থেসিস পদ্ধতি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কারণ আমি যদি বলি যে কবিতা কী — এটা তো খুব কঠিন প্রশ্ন। আমরা তো বলতে পারব না কবিতা কী। বলতে পারব কি? বা বললেও তা ওই অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো হবে। আমরা যদি বলি, সত্যি লিটল ম্যাগাজিন কী, এবং এইটাই হল লিটল ম্যাগাজিন, সেটা বলাও তার সব বৈশিষ্ট্যগুলিকে ছুঁয়ে বলা হবে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন, চেষ্টা তো একটা করতেই হয়, প্রকরণগত ভাবে, কিন্তু তবুও সব সংজ্ঞার্থ ধরা যায় না। এটা অনির্ণীত — বুদ্ধদেব বসুই বলছেন। ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র'কে বাংলা ভাষার, বঙ্গভাষার, প্রথম লিটল ম্যাগাজিন অর্থে তিনি দাবি করছেন। সম্পাদকের নাম বলা নিষ্প্রয়োজন, আপনারা জানেন, প্রমথ চৌধুরী। অন্নদাশঙ্কর রায় একটা দারুণ কথা বলছেন প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে, বলছেন যে প্রমথ চৌধুরীর কোনও লেখা পড়তে শুরু করলাম, দেখলাম এম এট ল। একজন উকিল মানুষ তিনি এই কাগজটা করতে পারলেন? হ্যাঁ পারলেন। পারলেন তিনটে প্রয়োজনে। কী রকম প্রয়োজন? এক নম্বর, নিজের প্রয়োজন। তাঁর চরিত্রগত প্রয়োজন — একটা মুক্তির আশ্বাস চেয়েছিলেন, যেটা সব সময় লিটল ম্যাগাজিনের থাকা দরকার বলে আমার মনে হয়। সে মুক্তি কীসের দিক থেকে, দু'রকম মুক্তি — একটা ভাবের দিক দিয়ে, একটা হচ্ছে ভাষার দিক দিয়ে। এবং দু নম্বর হচ্ছে কী — রবীন্দ্রনাথের জন্য। রবীন্দ্রনাথই নাকি প্রমথ চৌধুরীকে এরকম একটা পত্রিকা করার প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন। তার কারণ? তার কারণ, খুব স্বাভাবিক — শচীশ, যে শচীশ চতুরঙ্গে, যে শচীশ এক গর্ভবতী মহিলাকে বিয়ে করতে চায়, ননীবালাকে; একটা গুহার মধ্যে দামিনীর বুকের ওপর সে পা চালিয়ে দেয়; জ্যাঠামশাই অন্য ধরণের, মানে প্রথাগত নন, প্রথার বাইরে গিয়ে কথা বলেন, বৃত্তের বাইরে গিয়ে কথা বলেন — এসব তো প্রবাসীর রামানন্দবাবু নাও ছাপতে পারেন। তাহলে ছাপবেন কে? ছাপতে হলে সবুজপত্রকে ছাপতে হবে। সবুজপত্রের প্রথম যে মলাট, সেই মলাট সবুজ রঙের মলাট। এবং তার প্রচ্ছদ একটা তালপাখা। বিস্তারিত সেই তালপাখা, সে যেন তার উদ্ভাসিত হাওয়ায় বাংলা সাহিত্যকে মুগ্ধ করতে চলে এল। সবুজপত্রে আমরা কী কী লেখা পেলাম? পেলাম 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের

ঘা মেরে তুই বাঁচা!' লিটল ম্যাগাজিনের সাথী লেখকদের জন্যও এক উপদেশ বটে। আমিও 'বৌদ্ধ' — বুদ্ধদেবের ভক্ত, কিন্তু এইটা সবথেকে ভাল, একেবারে অব্যর্থ জায়গায় তীর মারলেন রবীন্দ্রনাথ। আপনারা একটু ভাবুন, বিমলা, নিখিলেশ এবং সন্দীপের আত্মকথা — রচনারীতির একটি অনরকম বয়ন, অথবা মোহের মোড়কে ভুল ভালোবাসার ত্রিকোণমিতি, এটা রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারছেন সবুজপত্রে।

সবুজপত্রের পরে যদি আমরা কারও কথা বলি, তাহলে বলতেই হবে পরিচয়ের কথা, এবং স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর যে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা, যেটি বাংলা কবিতাকে মূলত একেবারে একটা অন্য জায়গায় এনে স্থাপিত করল, বাংলা আধুনিক কবিতার নতুন তলগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করল যে পত্রিকা, সে 'কবিতা' এবং এই কবিতা পত্রিকায় অসাধারণ অসাধারণ সব কবিতা, নতুনদের কবিতা। মুখ্যত নতুনদের কবিতা, শক্তিশালী নতুনদের কবিতা, সামর্থ্যযুক্ত নতুনদের কবিতা, বুদ্ধদেব আস্তে আস্তে নিয়ে এলেন। নিশিকান্তর কবিতা, কী অদ্ভুত মেদুর; জীবনানন্দের কবিতা, জানেন আপনারা, দু'শো আটষট্টিটা কবিতা, তাঁর জীবদ্দশায় মুখ্যত লিটল ম্যাগাজিনেই ছাপা হয়েছিল।

এই তো গেল মোটামুটি ভাবে আমাদের ভাষা সাহিত্যের দিক থেকে কীভাবে লিটল ম্যাগাজিন আসছে, এবং কীভাবে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটা সে অন্য একটা আনুভূমিক তার সিঁড়ি তৈরি করছে, তার একটি সামান্যতম চিত্র। যদি ম্যাগাজিন শব্দটাকেই ধরি, তো ম্যাগাজিনের আরেক অর্থ যেখানে বারুদ ঠুসে দেওয়া হয়, বন্দুকের ম্যাগাজিনে বারুদ ভরে দেওয়া ম্যাগাজিন, দ্য ডায়াল, ১৯১২ হ্যারিয়েট মনরোর পোয়েট্রি, ১৯১৪ মার্গারেট আণ্ডারসনের লিটল রিভিউ, অথবা দ্য ক্রাইটেরিয়ান এবং এরকম অনেক আরও। শেষোক্তটিতে ছাপা হয়েছিল এলিয়টের সেই বিখ্যাত কবিতা। "Here is no water but only rock / Rock and no water and the sandy road / The road winding above among the mountains / Which are mountainous of rock without water" — ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ। 'what the thunder said,' — 'The Waste Land', ঘুরিয়ে দিল কবিতার মোড়। পৃথিবীর যত বিখ্যাত-বিখ্যাত লেখা, আপনারা যদি একটা সংখ্যাতত্ত্বর দিক দিয়ে যান, দেখবেন বেশিরভাগ রচনা সবই কিন্তু ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে। এবং সেগুলো পরবর্তীতে বিখ্যাত হয়ে গেছে এবং বিখ্যাত শুধু হয়েছে নয়, সমাজকে বদলে দিয়ে গেছে। যে কথাটা শঙ্খবাবু বলেছিলেন যে তারুণ্যের প্রতি স্পৃহা, আমি দেখতে পাচ্ছি, দ্রোহ, আগুন দেখতে পাচ্ছি, সেই তারুণ্য লিটল ম্যাগাজিনে ভরা আছে, ভরা থাকে, এইটিই কাম্য। তার সামর্থ্য, এখানে আর সবগুলি বাদ দিয়ে শুধু একটির কথা বলব, এখনও অবধি মোটামুটি ভাবে আমার মনে হয়েছে যে এই সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনার, ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন। আসলে আমি যেটা বলব আপনাদের, সেটা হচ্ছে — একটি সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি ডোনাল্ড নর্টন বলে এক মনোচিকিৎসক, তিনি বলেছেন যে লিটল ম্যাগাজিন মানুষের মনোবিকলনের লেখচিত্র আঁচ করার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। আমি তিনটে উদাহরণ তুলে আনব, প্রথম উদাহরণটা হল ১৯৪১ সালের, মার্চ মাসের ২৮ তারিখে। এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, বিখ্যাত কথাকার, তিনি তাঁর স্বামীকে চিঠি লিখছেন যে দেখো, আমার মধ্যে একটা এমন কিছু হচ্ছে, একটা এমন কিছু সংস্ক্রিয়া হচ্ছে যেটাতে আমি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি, আমি বোধহয় আর ঠিক থাকতে পারব না, এবং আমার মনে হচ্ছে আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি — তাঁর স্বামী লিওনার্দোকে লিখছেন, আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি, আমার মনে হচ্ছে যে আমি বোধহয় তোমার জীবনটাও নষ্ট করে ফেলব এবং শেষ পর্যন্ত সেই তারিখে, মার্চ মাসের আঠাশ তারিখে তিনি ওভারকোটের ভেতর পাথর নিয়ে আউশ নদীর তীরে নেমে গেলেন। আপনারা বুঝতেই পারছেন আমি ভার্জিনিয়া উলফ-এর কথা বলছি। এই ভার্জিনিয়া, যিনি ১৯০৪ সালে চার্চের ম্যাগাজিনে লিখছেন, একটা গল্প। লিখছেন — 'দ্য মিস্টিরিয়াস কেস অফ মিস ভি'। সেই গল্পে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি একটা ন'বছরের মেয়ে, সে সারিসারি গাছের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে

যাচ্ছে, এবং অবসন্ন হয়ে একটা গাছের তলায় বসছে, চারপাশে অসংখ্য সবুজ পাতা, সে কুড়িয়ে নিচ্ছে একটা খসখসে পাতা এবং তার মনে হচ্ছে এ জীবনে বোধহয় আর কিছুই রইল না। ''তবুও মরণ আসে''। এবং এই রচনাটা পড়ছেন কে জানেন? এই রচনা পড়ছেন, তাঁর যখন একুশ বছর বয়েস, এক বিখ্যাত কবি। তিনি ভালবেসে যাকে বিয়ে করেছিলেন, সে কবির নামও আপনারা জানেন, টেড হিউজ। সময় এগিয়ে যায়, পরে তাঁর ক্রমশ ক্রমশ মনোবিকার বড়ো হয়, এবং তিনিও এইরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করেন, ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করেন, এবং তারপর একদিন নিজের শিশু সন্তানকে বুকে ধরে শুইয়ে রেখে রান্নাঘরে গিয়ে উনুন জ্বালিয়ে গ্যাসের মধ্যে নিজের মাথা ঢুকিয়ে দেন — তাঁর নাম সিলভিয়া প্লাথ। ডোনাল্ড নর্টন বলছেন, যে কথা আমি বলছিলাম, যে তিনিও ছোটবেলায় একটা লিটল ম্যাগাজিনে গল্প লিখেছিলেন। সেটা একটা বিখ্যাত মহিলাদের পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন বলাটা বোধ হয় বাতুলতা হয়ে যাবে তাও আমি ম্যাগাজিনই বলছি, 'মাদমোয়েজেল', এখানে তিনি একটা গল্প লিখেছিলেন। 'সানডে এট দ্য মিন্টন্স' — এই গল্পটা আমাদের পড়তে হত — কিচ্ছু নয়, ভাইয়ের সঙ্গে বিকার, ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া, কিন্তু ওই ছোট্ট বালিকা স্বপ্ন দেখছে, মনে করছে যে ভাইটা না বাঁচলেই ভাল। সে চলে যাক, সমুদ্রের দিকে চলে যাক। কিচ্ছু হচ্ছে না, ভাই ক্রমশ সমুদ্রের দিকে চলে গেল, এবং পাথরের মাঝখানে পাথর ঠুকে সে জলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তারপর যখন কেউ এসে দরজা খুলে দিল তখন দেখল ভাইবোন দুজনেই খেলা করছে। এটাই গল্প। নর্টন সাক্ষাৎকারে বলছেন, ধারাবাহিকভাবে মুখ্যত কবি লেখকেরা যেখানে নিজের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে লিখতে পারেন, সেইসব লেখার স্টাডি যদি করা যায়,তাহলে তাদের মনের গতির দোলন, ডোপামিন, সেরিটোনিনের স্নায়ুসংবেদনার অবস্থার একটা ধারণা পাওয়া যাবেই।

জীবনানন্দ দাশের বোন সুচরিতা দাশ আমাদের মেদিনীপুরের তমলুকের রাজকুমারী সান্ত্বনাময়ী গার্লস স্কুলে পড়াতেন। দুর্ঘটনার কিছুদিন আগে থেকেই জীবনানন্দের মনে হচ্ছিল, তিনি যেন শুনতে পাচ্ছেন কোলাহল! দেশপ্রিয় পার্কে কে যেন আহত হয়েছেন ট্রামের ধাক্কায়! ভূমেন্দ্র গুহের 'আলেখ্য জীবনানন্দ' বইতে আমরা জানতে পারি — পরপর দু'দিন এই একই অনুভব বুকে ধারণ করে কবি ছুটে গেলেন ভাই অশোকানন্দ, বোন সুচরিতার বাড়ি। বললেন : তোরা একটু সাবধানে চলাফেরা করবি, বুঝলি! কী অবিশ্বাস্য, এগারো আর বারোই অক্টোবর এই ঘটনা,মাঝের তেরোতে আকাশবাণীতে কবিতাপাঠ আর চোদ্দ তারিখে প্রায় হুবহু, যা শুনতে পেয়েছিলেন, একইরকমভাবে নিজেই গুরুতর আহত হলেন ট্রাম দুর্ঘটনায়! ট্রাম-ড্রাইভারের বয়ান অনুযায়ী নিষেধ সত্ত্বেও এই উদাসীন অন্যমনস্ক মানুষটি লাইনের উপর থেকে সরে যাননি। জীবনানন্দ কি সে শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন, অথবা সতর্কতার ধ্বনি কিছুই পৌঁছায়নি তাঁর কানে! নীরেনদাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, নীরেনদা যখন সজলদার হাত ধরে এখানে আসতেন, জিজ্ঞেস করেছিলাম 'নীরেনদা আপনি তো জীবনানন্দ দাশকে দেখেছেন, কেমন করে কবিতা পড়তেন তিনি?' বললেন 'বাবা, মাথাটা এইরকম নামিয়ে একেবারে পড়তে শুরু করলেন। যেন এক মহাঘোরের মধ্যে তাঁর সেই উচ্চারণ। পড়া শেষ হল। তিনি সেভাবেই নেমে এলেন।'' ১৩৬১ বঙ্গাব্দে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশায় প্রকাশিত একটি কবিতার কয়েক ছত্র এখানে বলি : ফল নয় — কোনো নিরসন নয় — দু-জনের খুব কাছাকাছি/আসা নয়, — শুধু সময়ের শাদা-কালোর সাগরে / জল যেন ক্রমে শূন্য অন্ধ হয়ে ঝরে; / তোমাকে-আমাকে স্থির নিঃশব্দ করে।

লেখা থেকে জীবনে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা জানি না, তবুও জীবন লেখাকে নির্ধারিত করতে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা নেয়। লেখকের মনের অবস্থার খোঁজ বিষয়ক এই পয়েন্ট-টাই মুখ্যত বলার জন্যে আমি বোধহয় কথাকে ভণিতাময় করে তুললাম। কিন্তু আজকে সত্যিই খুব ভাল লাগছে যে আমি

দেবাশিসদার ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে আসতে পেরেছি। কিন্তু তবুও বুঝি বাঙালির তর্ক এবং দ্বন্দ্বের অবকাশের সমাধা হল না আমার বলায়। জানি না অবশ্য সেই সমস্যা বোধহয় ততোধিকও কি না যা আমরা নিজেরাই নিজেদের মতো করে তৈরি করতে ভালোবেসেছি! কথাটা আরও একটু গূঢ় করে বললে বলা উচিত আসলে লিটল ম্যাগাজিন লিটল ম্যাগাজিনের মতো আছে, আর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মতো আছে। প্রতিষ্ঠান আছে তো তার ডালপালা নিয়ে, তার পুঁজি নিয়ে, আর লিটল ম্যাগাজিন পাঁচজন বন্ধু মিলে তারুণ্যের স্পৃহা নিয়ে আছে। তবে কি প্রতিষ্ঠানের তারুণ্য নেই, তবে কি ভারী ভারী লিটল ম্যাগের সম্পাদকেরা সবাই পুঁজিহীন! তা নয়, আসলে এর বাইরেও একটি সমস্যা আছে, আমার বিচারে সেটাই মূল সমস্যা এবং তা হল, যখন দুটো ক্ষেত্রেই দ্বিচারিতার জায়গা তৈরি করছি আমরা। আমি প্রতিষ্ঠানের কাছে যাব, লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিষ্ঠানকে কবিতাটা দিয়ে আসব, লুকিয়ে লুকিয়ে আমার প্রবন্ধটা দিয়ে আসব, এবং লেখা অমনোনীত হলেই বলব প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বাজে। লিটল ম্যাগাজিনে লিখব, আর পাশের আগুন তরুণের লেখাটার দিকে ঘুরেও তাকাব না, এবং সেখানে লিখে কিছুতেই নিজেকে স্বস্তির জায়গায় রাখব না, সেটাও তো একধরণের ভাণ। বেশ কিছু লিটল ম্যাগের নামধারী সাধারণ পত্রিকার সম্পাদককে দেখেছি, তথাকথিত পরিচিত লেখকদের লেখা প্রথম পাতায় প্রকাশিত করেই পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে নির্লজ্জ আত্মপ্রচার করতে। যদিও এ উদাহরণ ব্যতিক্রম, আর ব্যতিক্রম নিয়মের প্রমাণ করে না, কিন্তু তা উদাহরণও তো বটে।

একটা অন্যরকম প্রবন্ধ লিটল ম্যাগাজিন সম্বন্ধে পড়েছিলাম, সেখানে লেখক লিখছেন বৈরিতা ব্যাতিরেকেও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও কিন্তু একটা প্রীতির সম্পর্ক আছে লিটল ম্যাগের। ভাবি সেটা ঠিক কী রকম! লেখক লিখছেন, হুবহু বাক্যটা মনে নেই, তবু মূল কথাটা এই যে লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে দিয়ে লেখকরা আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে উঠলে, প্রতিষ্ঠানও তাদের গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের কারখানা হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিন, এটা দেবদাস আচার্য লিখেছেন। তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আছে, সেটা পাওয়া যায়, আপনারা যদি ইন্টারনেট-এ খোঁজেন পেয়ে যাবেন, 'প্রসঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন' এই নাম যদি ভুল না করি। আমার মনে হয়, প্রতিষ্ঠান অথবা লিটল ম্যাগাজিন, যে কোনও নান্দনিক কাগজেই লেখা প্রকাশিত হলে, লেখকের একটা স্বীকৃতি তো থাকেই, এবং খুব ভিতরের স্তরে একটা আত্মবিশ্বাসের জায়গাও তৈরি হয়। সন্দীপ দত্ত লিটল ম্যাগের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে মোট আঠাশটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। লিটল ম্যাগাজিন তারুণ্যের প্রতিস্পর্ধী হবে, লিটল ম্যাগাজিনের বিষয় এমন হবে যে সেই বিষয় কোনও প্রতিষ্ঠান বা অন্য কেউ তা কল্পনা করতে পারবে না। আপনারা বিস্মিত হয়ে যাবেন শুনলে মেদিনীপুরের এক লিটল ম্যাগ চড়াই পাখির উপর একটি সংখ্যা করেছেন, বাঁকুড়ার এক লিটল ম্যাগ-এর বিষয় মন্দির গাত্রে ভাস্কর্য, ত্রিপুরার এক লিটল ম্যাগ একটা তথাকথিত রাস্তার ভিখারিদের জীবনযাত্রাকে তাঁদের লিটল ম্যাগের বিষয় করেছেন। এইসব লেখা পড়লে ভাল লাগে বইকি। যে সিলভিয়া প্লাথের কথা বলছিলাম আজ থেকে কুড়ি বছরের বেশি আগে অমৃতলোক তাঁর কবিতা অনুবাদ করে আমার মতো পাঠকদের সামনে এনেছিলেন। কালকেই তো বাসুদেববাবু, মাননীয় সচিব,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, বলছিলেন, কোথায় একটা লেখা পড়েছেন, ম্যাগাজিনেই হয়ত, এই যে আমরা বাঁশি বাজাই, বাঁশিকে নিয়ে দুর্দান্ত লেখা। আমাদের সমতলের মানুষরা বাঁশি বাজান একভাবে, মাটির সমান্তরালে তার অবস্থান। আবার দেখবেন নিম্ন গাঙ্গেয় যেখানে, অথবা দক্ষিণ ভারতের দিকে, বাঁশি অনেকটা শিঙার মতো তারা উঁচু করে ধরেন। আর আদিবাসীরা জঙ্গলে ভিতর থেকে পাহাড়ের উপরে মানুষকে আহ্বান দেন দূরে দূরে যাওয়ার জন্যে সেই একইরকম শিঙায়। কী নতুন ভাবনার কথা বললেন বাসুদেববাবু, আসলে আমরা সমতলের মানুষ, আমাদের ভূপ্রকৃতি নির্ধারণ করে যে আমাদের বাঁশিটা এইভাবে ধরতে হবে। আবার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নিচের মানুষকে ডাকার জন্যে আমাদের ওই ধরণের

বাঁশিকে ধরতে হয় নীচের দিকে।

তো মোটামুটি ভাবে এই, আমি যে কথাটা প্রথমেই বলেছি, এখনও বলছি, আমার বক্তব্যের তিরিশ মিনিটও হয়ে গিয়েছে, তা আরও একবার বলে নিই, লেখক তিনি স্বাধীন হবেন, লিটল ম্যাগাজিন বা প্রতিষ্ঠান যে কোনও পছন্দমতো জায়গাতেই তিনি লিখুন না কেন, তিনি সৎ হবেন, দ্বিচারিতাহীন হবেন। যে বা যারা, যেমন আছেন থাকুন, আপনি আপনার পছন্দ বেছে নিন। হতে পারে একটি, অথবা দুটি ক্ষেত্রেই আপনি স্বচ্ছন্দ, হতে পারে ওয়েব ম্যাগাজিনেই আপনি লিখতে ভালবাসেন। তাতে কী অসুবিধে! লেখকের মূল দায়িত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠান বা লিটল ম্যাগ, বা সংবাদপত্র বা ওয়েবজিনের সমালোচনা করার চেয়ে তার পাখির চোখ, লেখা। সেই সৎ লেখার ভিতর নিজেকে উপনীত করা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।

সব শেষে, আমাকে শুভময়দা বলছিলেন যে নির্মাল্যের কবিতা খুব প্রিয়, আমি এই লোভ, এই একই সাথে অনুরোধের ছলনাটা সামলাতে পারছি না, ফলত নিজের একটা কবিতা দিয়েই আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব। গলার অবস্থা দেখে বুঝতেই পারছেন কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, জ্বরের ভিতর, তবুও ভগ্নকণ্ঠে একটি কবিতা পড়ছি। বলা বাহুল্য, বহুপূর্বে লেখা এই কবিতাপাঠ দিয়েই আজ আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

কাগজকুচি অক্ষয়

মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে কাগজ বের করি —
গ্রামের কাগজ, পুরনো প্রেসে,
ব্লক করেই ছাপি, কষ্ট হয়,
আর পাঁচটি কাজের পাশে পড়ে থাকতে দেখি আমার ম্যাগাজিন,
নবীন তরুণ কবিদের লেখা শুয়ে আছে ওর ভেতর,
শব্দ, ধুলো, ঝুল পেরিয়ে আলো চাইছে তারা।
আলো।
দেবী মায়ের কৃপায় যেদিন প্রথম সংখ্যা পাই,
তৎক্ষণাৎ বিলিয়ে দিই পুরনো বন্ধুদের।
তারপর সাইকেল-এ করে বাড়ি,
খেয়ে ঘুমোবার আগে
দেখি জানলা বেয়ে উড়ে যাচ্ছে হাওয়া —

উড়তে উড়তে ধানের গোলা, ছিন্ন কাগজকুচি,
আমার অরূপ মহাকাশের সামান্য অক্ষয়।

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় : কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। পেয়েছেন কৃত্তিবাস পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত অনিতা-সুনীল কুমার বসু স্মারক পুরস্কার।